সামাজিক শ্রেণী (Social Class)

সামাজিক স্তরবিন্যাসের (Social stratification) একটি বিশেষ দিক হিসাবে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের কথা বলা হয়। সমাজে যে প্রকার বিভাগ অপেক্ষাকৃত স্থায়ী এবং উচ্চ-নীচ বিভাগ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং যে প্রকার বিভাগ আনুভূমিক (Horizontal division) এই জাতীয় বিভাগকে সমাজতাত্ত্বিকগণ সামাজিক স্তরবিভাগ (Social stratification) বলেছেন। সমাজের শ্রেণী ও জাতি বিভাগ এই বিভাগের অন্তর্গত।

‘শ্রেণী’ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। স্বভাবতই শ্রেণীর কোন সংক্ষিপ্ত অথচ সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। মানব সমাজে কালের প্রবাহে শ্রেণী সম্পর্কিত ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। তা ছাড়া সমাজব্যবস্থার কাঠামোরও রদবদল ঘটেছে। তারফলে শ্রেণী সম্পর্কিত ধারণারও পরিবর্তন ঘটেছে। তাই সামাজিক শ্রেণীর সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া মোটেই সহজ বিষয় নয়। এই কারণে বিভিন্ন দিক থেকে শ্রেণী চরিত্র ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়াস সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। আর্থিক সংগতি, সামাজিক মর্যাদা, মনস্তত্ত্ব, শক্তি-সামর্থ্য প্রভৃতি বিভিন্ন দৃষ্টীভঙ্গী থেকে শ্রেণীর ধারণা ব্যাখ্যা করা হয়। বিভিন্ন যুগে শ্রেণী সম্পর্কিত ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে এবং শ্রেণী এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে বিভিন্নভাবে। বিভিন্ন সমাজত্ত্ববিদ্ ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে সামাজিক শ্রেণী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

সামাজিক শ্রেণী সম্পর্কে গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের আলোচনা আছে। মানুষের স্বাভাবিক গুণগত যোগ্যতার ভিত্তিতে প্লেটো তিনটি শ্রেণীর কথা বলেছেন। আদর্শ গণ-রাজ্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তিনটি শ্রেণী নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে বিশেষভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন। প্রতিটি শ্রেণী স্বাভাবিক যোগ্যতা অনুসারে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করলে বাস্তবে আদর্শ গণ-রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সামাজিক শ্রেণী সম্পর্কিত গ্রীক্ মণীষী প্লেটোর এই অভিমত প্রাচীনকালের হিন্দু সমাজের শ্রেণীবিন্যাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সনাতন হিন্দু সমাজ গুণ ও কর্ম অনুসারে চতুর্বর্ণে বিভক্ত ছিল। এই বর্ণ বিভাজনের ভিত্তিতে জাতিভেদ ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

অপর এক গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলও রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে তিনটি শ্রেণীর কথা বলেছেন। তাঁর মতে সম্পদ-সামগ্রীর মালিকানার পরিমাণের পরিপ্রেক্ষিতে এই তিনটি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। আবার অর্থনীতি ব্যবস্থার তারতম্যের ভিত্তিতে এই তিনটি শ্রেণীর শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণের ক্ষেত্রে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বলেন যে রাষ্ট্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নাগরিকের সংখ্যা বেশী, সে রাষ্ট্রের সুশাসনের সম্ভাবনাও বেশী। অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নাগরিকদের নিয়ে গঠিত রাষ্ট্রই হল সর্বোত্তম গুণমানযুক্ত রাষ্ট্র।

শ্রেণী সম্পর্কে বিভিন্ন সমাজ দার্শনিকদের দেওয়া সংজ্ঞা ঃ

অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ এই প্রসঙ্গে বলেন, 'সামাজিক শ্রেণী বলতে বোঝায় সম্প্রদায়ের এমন এক খণ্ডাংশ যা মর্যাদা অনুসারে অন্যান্য অংশ থেকে স্বতন্ত্র।' সামাজিক শ্রেণী প্রথমতঃ মর্যাদা অনুসারে উঁচু-নীচভাবে অবস্থান করে; দ্বিতীয়ত ঃ শ্রেণী-মর্যাদা সমাজস্বীকৃত হয় এবং শ্রেণী সদস্যরা ঐ মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন থাকে, তৃতীয়ত ঃ সামাজিক শ্রেণীর সাংগঠনিক স্থায়িত্ব থাকে। প্রত্যেক শ্রেণীর সদস্যদের মধ্যে সামান্য ব্যাপারে পার্থক্য থাকলেও তা তাদের পারস্পরিক শ্রেণী সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন বাধা সৃষ্টি করে না। তবে প্রত্যেক শ্রেণী অন্য শ্রেণী থেকে উচ্চতরভাবে বা নিম্নতরভাবে সম্বন্ধের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবস্থান করে।

সামাজিক শ্রেণী প্রসঙ্গে গিন্‌স্‌বার্গ বলেন, 'সামাজিক শ্রেণী বলতে বোঝায়, সম্প্রদায়ের বিশেষ কোন অংশকে বা জনগোষ্ঠীকে যারা সমতার ভিত্তিতে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং সমাজ স্বীকৃত উঁচু-নীচু মানদণ্ডের দ্বারা এক জনগোষ্ঠী অপরাপর জনগোষ্ঠী থেকে ভিন্ন ভিন্ন হয়।'

সুতরাং বলা যায় সামাজিক শ্রেণী সৃষ্টির হয় সামাজিক দুরত্ববোধ থেকে। সমাজব্যবস্থার অর্ন্তভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে বিভিন্নতা থাকে। তারফলে ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সৃষ্ট হয় পার্থক্য বা সামাজিক প্রতিবন্ধকতার। এই প্রতিবন্ধকতাই সৃষ্টি করে সামাজিক দূরত্বের এবং অবশেষে সামাজিক দূরত্বই জন্ম দেয় সামাজিক শ্রেণীর।

সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা শ্রেণীবিভাগ তাৎপর্যপূর্ণ। এর তাৎপর্য হল এই যে, সমাজের একটি অংশ অন্যান্য অংশের থেকে নিজেদের উন্নত বলে মনে করে এবং এই চেতনার তাগিদে তারা অন্যান্যদের তুলনায় নিজেদের উন্নত বলে মনে করে এবং এই চেতনার তাগিদে তারা অন্যান্যদের থেকে নিজেদের সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে সতর্ক ও সচেষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে এই পার্থক্যবোধই হল শ্রেণীর আত্মসচেতনতার মূল কারণ ও লক্ষণ। বস্তুত এ সকল ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ নিয়ন্ত্রিত হতে দেখা যায়। তখনই সমাজে শ্রেণীবিভাগের সৃষ্টি হয়, যখন সমাজব্যবস্থার অর্ন্তগত ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে; এবং এই বিভাগের কারণ হল সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে বিভিন্নতা। অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজের মতে বৃত্তি বা আর্থিক আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন দল সমাজে ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদা লাভ করে থাকে। সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে এই ধরনের তারতম্য বা উর্ধ্বাধঃ (Hierarchical) বিন্যাসের কারণে এক দল অন্যান্য দলের থেকে পৃথক প্রতিপন্ন হয় এবং এইভাবে সৃষ্টি হয় সামাজিক শ্রেণীর।

অধ্যাপক বটোমোর (T.B. Bottomore) তাঁর সোসিয়োলোজি (Sociology) গ্রন্থে সামাজিক শেণী সম্পর্কে বলেন, বাস্তবতঃ সামাজিক শ্রেণী হল একটি গোষ্ঠী। তবে এই গোষ্ঠী আইন বা ধর্মের দ্বারা স্বীকৃত বা নির্দিষ্ট নয়। তাঁর অভিমত অনুসারে ধনতান্ত্রিক শিল্পসমাজ গড়ে উঠেছে সপ্তদশ শতাব্দী থেকে এবং এই শিল্পসমাজেরই বৈশিষ্ট্যসূচক একটি গোষ্ঠী হল সামাজিক শ্রেণী। সামাজিক শ্রেণীর মূল ভিত্তি হল অর্থনৈতিক কারণ। এ বিষয়ে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। সামাজিক শ্রেণী বলতে কেবল মাত্র অর্থনৈতিক গোষ্ঠীকেই বোঝায় না, শ্রেণী হল আরও অতিরিক্ত কিছু। সামাজিক শ্রেণী কোন বদ্ধ গোষ্ঠী নয়। এ হল তুলনামূলকভাবে মুক্ত।

অধ্যাপক জিসবার্ট (Gisbert) এই প্রসঙ্গে সামাজিক ক্ষেত্রে উর্ধ্বাধঃ অবস্থান বা তারতম্যের কথা বলেছেন এবং সাথে সাথে সম্পর্কের স্থায়িত্বের কথাও বলেছেন। তিনি এই দুধরনের বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণীর ধারণার ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

অধ্যাপক অগ্‌বার্ণ ও নিমকফ (W.F. Ogburn & M.F. Nimkoff) তাঁদের A Handbook of Sociology শীর্ষক গ্রন্থে বলেন, মানবসমাজে বৃত্তিমূলক শ্রেণীবিভাগের ফলে সামাজিক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। কারণ সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের আয়, মানসিকতা, শিক্ষা, বিশ্বাস, জীবনযাত্রার প্রণালী প্রভৃতির সঙ্গে পেশাগত সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট। অধ্যাপক অগ্‌বার্ণ ও নিমকফের অভিমত অনুসারে সামাজিক শ্রেণীর মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর পরিপ্রেক্ষিতে তার অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠত্ব বা হীনতাব্যঞ্জক সামাজিক অবস্থান।

মরিস জিনসবার্গ (Morris Ginsberg) সামাজিক শ্রেণী প্রসঙ্গে বলেন, সামাজিক শ্রেণী হল জনসমষ্টির একটি অংশ। জনসমষ্টির এই অংশ শিক্ষায়, বৃত্তিতে অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র এবং তারা পারস্পরিক সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সকল সামাজিক শ্রেণীরই মূলগত কতকগুলি ক্ষেত্রে সমতা বর্তমান থাকে। তবে মানসিক দিক থেকে একটি শ্রেণী অন্যান্য শ্রেণী থেকে স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যযুক্ত। দুই দিক থেকে এই বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা করা যায়। ১) অভিন্ন শ্রেনীর অর্ন্তভূক্ত সদস্যদের মধ্যে সাম্যের মনোভাব বর্তমান থাকে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে অল্পবিস্তর পার্থক্য থাকলেও থাকতে পারে।। কিন্তু এই সামান্য পার্থক্য শ্রেণীচেতনার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে না। ২) শিক্ষা, বৃত্তি, আয়, জীবন ধারণের পদ্ধতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া মানসিক ও বাহ্যিক দিক থেকে একটি শ্রেণী অন্যান্য শ্রেণী থেকে স্বতন্ত্র।

শ্রেণী সম্পর্কে মসকা (Mosca)ও প্যারেটো (Pareto) বলেন, সকল সমাজেই দুই শ্রেণীর মানুষ দেখা যায়। এই দুটি শ্রেণীর একটি হল শাসক শ্রেণী এবং অপরটি হল শাসিত শ্রেণী। সব সমাজেই সংখ্যালঘু কিন্তু প্রভাবশালী কিছু মানুষ থাকে। এদের সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ কিছু মানুষের মতানৈক্য বর্তমান থাকে। প্যারেটো উৎকৃষ্টততর গুণসম্পন্ন মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ও ব্যক্তিগত গুণাবলীর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অপরদিকে মসকার মতানুসারে বিশিষ্ট কিছু পরিবারের হাতে ধারাবাহিকভাবে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। তবে রাজনৈতিক শ্রেণী সম্পর্কে মসকার কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। এক্ষেত্র তিনি দ্বিধা-দ্বন্দ্বের উর্দ্ধে উঠতে পারেন নি।

সামাজিক জাতি **(Social Caste)**

জাতির ইংরেজী প্রতিশব্দ হল ‘Caste’। ইংরেজী ‘Caste’ শব্দটি এসেছে স্প্যানিশ শব্দ ‘কাস্টা’(Casta) থেকে। ‘কাস্ট’ শব্দটির অর্থ হল জাতি, কুল প্রভৃতি। তবে ভারতবর্ষে জনগোষ্ঠী প্রসঙ্গে ‘জাতি’ শব্দটি সর্বপ্রথম প্রয়োগ করেন পর্তুগীজগণ। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক জিসবার্ট তাঁর Fundamentals of Sociology গ্রন্থে বলেন, "The word caste is derived from the Spanish casta meaning breed, strain, or hereditary qualities. It was applied by the Portuguese to the particular Indian known by the name Jati'।

মনে করা হয় যে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার অর্ন্তভূক্ত ‘জাতি’ অর্থেই পর্তুগীজরা ‘Caste’ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় জাতি হল একটি জনগোষ্ঠী। অধ্যাপক এম্. এন্. শ্রীনিবাসন (M.N. Srinivasn) এর অভিমত অনুসারে ‘জাতিপ্রথা’ হল নিঃসন্দেহে একটি সর্বভারতীয় ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা সর্বভারতীয় এই অর্থে যে এর মধ্যে সকলেরই স্থান জন্মসূত্রে নির্ধারিত। হিন্দু দর্শনের চতুবর্ণ ব্যবস্থার মধ্যেই জাতি প্রথার উৎপত্তির উৎস বর্তমান। গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে চতুবর্ণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত।

জাতি কাকে বলে এসম্পর্কে কোন সহজ সরল সংজ্ঞা এককথায় দেওয়া অসম্ভব। ভারতের সামাজিক বাস্তবতার চিত্র অতিমাত্রায় জটিল। বিশাল এই দেশের জনসংখ্যা বিপুল। ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়গত বিভিন্নতা সীমাহীন। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বসবাস করে। আচার-বিচার ও সংস্কারগত পার্থক্য অস্বীকার করা যায় না। ফলে এত রকম পার্থক্যের ওপর দাঁড়িয়ে জাতি সম্বন্ধে একটি সার্বিক সংজ্ঞা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

জাতি হল জন্মভিত্তিক। জাতি শব্দটি সৃষ্টি হয়েছে ‘জন’ ধাতু থেকে। ‘জন’ বলতে জন্ম বোঝায়। আর তাই জাতি হল জন্মভিত্তিক। জন্মভিত্তিক বলেই জাতি হল অপরিবর্তনীয়। সামাজিক গোষ্ঠী হিসাবে বিবেচনা করলে জাতি হল বৃত্তিগতভাবে বিশেষীকৃত একটি গোষ্ঠী। তাছাড়া জাতির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল অন্তর্বিবাহ। অধ্যাপক আলি আশরাফ ও এল. এন. শর্মা (Dr. Ali Ashraf & L.N. Sharma) তাঁদের Political Sociology গ্রন্থে জাতি প্রসঙ্গে বলেন, "In terms of social group, caste is an occupationally specialized group which is close-knit on account of the fact social custom sanctions marriage within the same caste'।

মজুমদার ও মদন (D.N. Mazumdar & T.N. Madan) তাঁদের An Introduction to Social Anthropology শীর্ষক গ্রন্থে বলেন, জাতি হল একটি বদ্ধ গোষ্ঠী। বস্তুত জাতি বলতে এক আন্তর্বৈবাহিক গোষ্ঠীকে বোঝায়। এ হল এক বংশানুক্রমিক গোষ্ঠী। অধ্যাপক এন. কে. দত্ত (N.K. Dutta) জাতিব্যবস্থা প্রসঙ্গে বলেন, স্বজাতি ব্যতিরেকে অন্য জাতির মধ্যে বিবাহ সম্পাদিত হয় না। বিভিন্ন জাতির মধ্যে খাদ্য ও জল গ্রহণের ব্যাপারে বিধি-নিষেধ বর্তমান। জাতিসমূহের মধ্যে উর্ধ্বাধঃ স্তরবিন্যাস পরিলক্ষিত হয়। এই স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মাণই সর্ব্বোচ্চ স্থানের অধিকারী। ব্যক্তি-মানুষের জাতি নির্ধারিত হয় জন্মসূত্রে। ব্যক্তিকে নিজের জাতির মধ্যে আজীবন অতিবাহিত করতে হয়। উচ্চ জাতিতে উত্তরণ বা নীচ জাতিতে অবনমনের ঘটনা ঘটে না।

কুলী (C. H. Cooley) এই প্রসঙ্গে তাঁর Social Organization গ্রন্থে বলেন, When a class is somewhat strictly hereditary we may call it a caste. এই গোষ্ঠীর সদস্যরা উৎপত্তিসূত্রে অভিন্ন ও সমজাতীয়। জাতিগোষ্ঠীর সদস্যরা চিরাচরিত ও অভিন্ন বৃত্তির অনুসারী হয়। সামাজিক ক্ষেত্রে এই গোষ্ঠীর সদস্যদের কতকগুলি বিশেষ বিধি-নিষেধ বা আচার-বিচার মেনে চলতে হয়। হারবার্ট রিসলে (Herbert Risley) র মতে বহু পরিবার বা পরিবারের অনেক দলের এক সমষ্টি হল জাতি।

জাতি পরিচিত হয় একটি সাধারণ নামে। প্রত্যেক জাতির সদস্যদের পেশা নির্দিষ্ট। এরা বিশ্বাস করে যে, অভিন্ন এক কাল্পনিক পূর্বপুরুষ থেকে এদের সৃষ্টি। এ প্রসঙ্গে হেনরী মেইন (Henry Maine) বলেন, জাতি সৃষ্টি হয়েছে পেশাগত স্বাভাবিক শ্রেণীবিভাজনের ভিত্তিতে। কালক্রমে এই শ্রেণীবিভাজন ধর্মীয় অনুমোদন লাভ করে ও সুদৃঢ় হয়। এইভাবে বর্তমান জাতি ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। সুতরাং ধর্মীয় বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে হিন্দু সমাজে আবির্ভূত হয়েছে জাতিভেদ প্রথা। এই ধর্মমতই মানুষকে উচ্চ-নীচ গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে। এই সকল গোষ্ঠীর কাজকর্ম, দায়দায়িত্ব, ও জীবনযাত্রার মান ভিন্ন ভিন্ন।

অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ এই প্রসঙ্গে বলেন, 'When status is wholly predetermined, so that men are born to their lot without any hope of changing it, then class takes the extreme form of caste'। ঐতিহ্যগতভাবে জাতি ব্যবস্থা সামাজিক কাঠামোতে মর্যাদা, সুযোগ-সুবিধা, কর্তৃত্ব ও আনুগত্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে উর্ধ্বাধঃ বিন্যাসর সৃষ্টি করে। জাতি প্রথার ভিত্তিতে ভারতের সমাজ ব্যবস্থার ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাস। এইভাবে জাতি ব্যবস্থা সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের ওপর অসাম্যকে আরোপ করে।

আঁদ্রে বেতে (Andre Beteille) তাঁর Caste in a South Indian Village গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলেন, জাতি হল একটি প্রথা। এই প্রথার ভিতরে বর্তমান থাকে বিভিন্ন নামে চিহ্নিত ছোট ছোট এক একটি জনগোষ্ঠী। এ রকম প্রতিটি জনগোষ্ঠীর সদস্যারা আন্তর্বৈবাহিক রীতি, বংশগত সদস্যপদ এবং নির্দিষ্ট একটি জীবনধারা অনুসরণ করে চলে। এই জীবনধারা সাধারণত সাবেকি বিশেষ ধরনের বৃত্তি বা পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকে।

অধ্যাপক শ্যামাচরণ দুবে (S. C. Dube) এই প্রসঙ্গে বলেন, জাতি হল একটি জনগোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর মানুষজন অন্তর্বিবাহ করে। এই গোষ্ঠীর সদস্যদের আচরণবিধি নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকে। গোষ্ঠীর মানুষজন নিজস্ব বৃত্তি ও পেশাতেই নিযুক্ত থাকে। এই জনগোষ্ঠীকেই জাতি বলা হয়।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ